Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ৫ ডিসেম্বর, ২০২৩

৪৬ বর্ষ ৪৬ সংখ্যা ৪ ডিসেম্বর, ২০২৩, সোমবার, ১৭ অগ্রহায়ণ, ১৪৩০

কম জল—বোরো চাষে ক্ষোভ কৃষকদের

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৩ ডিসেম্বর : জলাধারগুলিতে জলের পরিমাণ কম থাকায় বোরো মরশুমে গত বছরের তুলনায় কম জল ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিল ডিভিসি কর্তৃপক্ষ। ৩০ নভেম্বর বর্ধমানের সার্কিট হাউসে ডিভিশনাল কমিশনার সুরিন্দর গুপ্তা পাঁচ জেলার প্রতিনিধিদের নিয়ে বৈঠক করেন। এই জেলাগুলিতে রবি চাষের জন্য ২৬ ডিসেম্বর থেকে ও আগামী বছর ২৬ জানুয়ারি থেকে জল ছাড়া হবে বলে জানানো হয়েছে। জল কম দেওয়ায় পূর্ব বর্ধমান জেলার ক্ষেত্রে গত বছরের তুলনায় চাষের ক্ষেত্র অনেকটাই কমবে বলে মনে করা হচ্ছে। যদিও পূর্ব বর্ধমান জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জেলাশাসক পূর্ণেন্দু মাজি জল দেওয়ার পরিমাণ যাতে বাড়ানো যায় তার জন্য ডিভিসি কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানিয়েছেন।

জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, চলতি বছরে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কম হওয়ায় মাইথন ও পাঞ্চেত জলাধারে জলের মজুত কম রয়েছে। মাইথন জলাধারে জলের পরিমাণ রয়েছে ৪৮২.২৮ হাজার একর ফুট। পাঞ্চেত জলাধারে ৪১১.৮৫ হাজার একর ফুট।

বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, হুগলি, হাওড়া ও বাঁকুড়া জেলায় মোট ৫০ হাজার একর জমিতে এই মরশুমে চাষের জন্য জল ছাড়া হবে। গত বছর প্রায় ৭২ হাজার একর জমিতে চাষের জন্য জল ছাড়া হয়েছিল। এক্ষেত্রে, পূর্ব বর্ধমান জেলায় গত বছর ৪৭ হাজার ৫০০ একর জমিতে রবি ও বোরো চাষের জল দেওয়া হয়েছিল। দুটি জলাধার থেকে এবছর মোট ১৫২ হাজার একর ফুট জল ছাড়া হবে বলে জানানো হয়েছে। পূর্ব বর্ধমান জেলায় ২৭ হাজার একর জমিতে জল দেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে। যদিও জেলার কোন অংশে এই জল দেওয়া হবে সেই বিষয়ে এখনও সিদ্ধান্ত হয়নি।

ডিভিশনাল কমিশনার সুরিন্দর গুপ্তা জানান, ডিভিসি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে জলাধারগুলিতে জলের মজুত পরিমাণ খতিয়ে দেখে জল ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। জানানো হয়েছে, পরিস্থিতি অনুসারে ১৪৪ হাজার একর ফুট জল ছাড়া যাবে বলে তারা জানিয়েছে। পরবর্তীকালে এই পরিমাণ বাড়ানো হবে। অন্যান্য বছরের তুলনায় জল ছাড়ার পরিমাণ অনেকটাই কমানো হয়েছে। জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে প্রচার করে এই বিষয়ে চাষিদের জানানো হবে।

পূর্ব বর্ধমানের জেলাশাসক পূর্ণেন্দু মাজি জানান, প্রাথমিকভাবে বৈঠকে

—এরপর চারের পাতায়

বিজ্ঞান মঞ্চের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন

নিজস্ব সংবাদদাতা, গলসী, ২ ডিসেম্বর : পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের ৩৮তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমানের বিভিন্ন বিজ্ঞান কেন্দ্র ও চক্র এলাকায় পতাকা উত্তোলন করা হয়। শহিদের মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়।

সারা ভারত বিজ্ঞান চেতনা প্রসার অভিযান কর্মসূচির সূচনা হয়। এই অভিযান শুরু হয়েছে তিনটি প্রধান ভাবনাকে সামনে রেখে—(১) জীবন ও জীবিকার জন্য বিজ্ঞান (২) যুক্তিবাদ ও মুক্ত চিন্তার প্রসার ও (৩) জল, জমি, বন ও বিদ্যুতের অধিকার। তদনুযায়ী উত্তরবঙ্গে দুটি ও দক্ষিণবঙ্গে তিনটি, মোট ৫টি অভিযান শুরু হয়েছে। কর্মসূচি চলবে আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ জাতীয় বিজ্ঞান দিবস পর্যন্ত।

গত ২৯ নভেম্বর ২০২৩ বিজ্ঞান মঞ্চের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে বর্ধমান শহরের জাগরী ভবন, কাটোয়া, কালনা, গলসী, গুসকরা ও সদর-২ এলাকায় এবং কাঁকসা (আঃ প্রফুল্ল চন্দ্র রায়), দুর্গাপুর (আঃ সত্যেন্দ্রনাথ বসু),ডাঃ কাদম্বিনী গাঙ্গুলী (সিটি সেন্টার-বেনাচিতি), আণ্ডাল (এপিজে আব্দুল কালাম), রানীগঞ্জ, আসানসোল, কুলটি (আঃ জগদীশ চন্দ্র বসু) ও সি ভি রমন বিজ্ঞান চক্রে (রাধানগর রোড) সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করে সারা ভারত বিজ্ঞান চেতনা প্রসার অভিযানের প্রয়োজনীয়তা কেন তা সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরেন যথাক্রমে চন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, কল্লোল ঘোষ, আশুতোষ পাল, রামপ্রণয় গাঙ্গুলী, অরুণ কিরণ চ্যাটার্জী, কিংশুক মুখার্জি, শ্রীকান্ত চট্টোপাধ্যায়,স্বপ্না চট্টরাজ,বীর বক্সবাহন ঢল, ধনুষধারী রাই, গলসী হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক কবিরুল ইসলাম প্রমুখ।

বুথে বুথে শক্তিশালী সংগঠন গড়ে তোলার আহ্বান

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ৩ ডিসেম্বর : কৃষক, খেতমজুর, শ্রমিকদের ঐক্য গড়ে তুলে বুথে বুথে শক্তিশালী সংগঠন গড়ে তুলতে হবে। মানুষের দাবিগুলিকে নিয়ে লড়াই আন্দোলন জারি রাখতে হবে। এদিন পূর্বস্থলী কমিউনিটি হল চত্বরে অনুষ্ঠিত সভায় বলেন সিপিআই(এম) পূর্ব বর্ধমান জেলা সম্পাদক সৈয়দ হোসেন। ইনসাফ যাত্রা ও ৭ জানুয়ারি ব্রিগেড সমাবেশ সফল করার লক্ষ্যে সৈয়দ হোসেন ছাড়াও সভায় বক্তব্য রাখেন বিন কাসিম শেখ। সিপিআই(এম)-এর পূর্বস্থলী-২ এরিয়া কমিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এই সভা পরিচালনা করেন শিক্ষক নেতা প্রদীপ কুমার সাহা। সৈয়দ হোসেন বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার পুঁজিবাদী নীতি নিয়ে

দেশ পরিচালনা করছে। তাই কর্পোরেটের ঋণ মকুব হচ্ছে।

কিন্তু আপনার আমার ঋণ মকুব হচ্ছে না। কর্পোরেট সংস্থার কর কমিয়ে আমজনতার উপর বাড়তি করের বোঝা চাপানো হচ্ছে। তাই মানুষের দাবি আদায় করতে কৃষক খেতমজুর শ্রমিকরা ঐক্যবদ্ধভাবে বিকল্প লড়াই আন্দোলন জারি রেখেছে। এই শ্রেণি ঐক্যকে আরও শক্তিশালী করার উদ্যোগ নিতে হবে আমাদের। বুথে বুথে শক্তিশালী সংগঠন গড়ে তুলতে হবে।

রশ্মি ব্লাড ব্যাঙ্কের জন্য অর্থদান

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান : শহীদ শিবশঙ্কর সেবা সমিতির রশ্মি ব্লাড সেন্টারকে আরও উন্নত মানের করা হয়েছে। কম্পোনেন্ট সেপারেশন ইউনিট এর জন্য যে বিপুল পরিমাণ অর্থ দরকার সেই কাজে এগিয়ে এলেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন কর্মী অরুণ মজুমদার এবং কৃষ্ণা মজুমদার। আজ তাঁরা ৫০ হাজার টাকার চেক্ সেবা সমিতির সম্পাদক ডাঃ সম্বরণ প্রামাণিক-এর হাতে তুলে দিলেন, উপস্থিত ছিলেন যুগ্মসম্পাদক ডাঃ গীস্পতি চক্রবর্তী, সহসম্পাদক ডাঃ সুধাকর মণ্ডল, ডাঃ দিবেন্দু রায় প্রমুখ।

খেতমজুর আত্মঘাতী

নিজস্ব সংবাদদাতা, ২ ডিসেম্বর, মেমারি : বাঁকুড়ার কমলের বাসিন্দা ১ মাস আগে ধানকাটার কাজে মেমারি নান্দিয়ারা গ্রামে আসে নন্দ বাউড়ি (৬৫)। যে বাড়িতে থাকতো সে বাড়িতে রাতে গলায় গামছার ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছে বলে জানান তার ছেলে গৌতম বাউরি। মেমারি থানায় খবর দেওয়া হলে পুলিশ এসে ওই খেতমজুরের দেহ উদ্ধার করে মৃতদেহটি ময়না তদন্তের জন্য বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।

জন্মদিনে দৃষ্টিহীন যুবকের রক্তদান

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১ ডিসেম্বর : একজন জন্মগত দৃষ্টিহীন যুবক তার জন্মদিনে রক্তদান করেন কালনা হাসপাতালে। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.এ পাঠরত সুমন বৈদ্যের বাড়ি কালনা থানার সাতগাছি গ্রাম পঞ্চায়েতের রামকৃষ্ণপল্লী গ্রামে। সুমন বৈদ্যরা তিন ভাই জন্ম থেকেই দৃষ্টিহীন। দুই ভাই রেলে হকারি করেন। আর সুমন বৈদ্য পড়াশোনা করে সমাজের আর পাঁচটা মানুষের মতো মানুষ হওয়ার চেষ্টা করছেন।

উৎপাদন খরচ বাঁচাতে ধান কাটতে যন্ত্র

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২ ডিসেম্বর : শীতের সাথে আমন ধান কাটার ভরা মরশুমও এসে গেছে। কিন্তু সেইভাবে খেতমজুরদের কাজ নেই। কারণ কৃষিক্ষেত্রে পুঁজির অনুপ্রবেশে দাপট বেড়েছে যন্ত্র দানবের। উৎপাদন ব্যয় কমানোর পাশাপাশি সময় বাঁচাতে কৃষকরা আমন ধান কাটতে যন্ত্রকেই বেছে নিচ্ছেন। অন্যদিকে ১০০ দিনের কাজও দুই বছর ধরে একেবারে বন্ধ। আর তাই খেতমজুররা কাস্তে-কোদাল ঘরে ফেলে রেখে পরিযায়ী শ্রমিক হয়ে ভিন রাজ্যে গাড়ি

দিচ্ছেন। তাই এক সময়ে আমন ধান কাটার মরশুমে সুখে থাকার সোনালি দিনগুলির কথা খেতমজুররা ভুলতে বসেছে।

কালনার আলু ব্যবসায়ী এবং কৃষকরা চরম বিপাকে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১ ডিসেম্বর : হিমঘরের বর্ধিত ভাড়া মেটানো মানেই আলু ব্যবসায়ী ও কৃষকদের কাছে মরার উপর খাড়ার ঘা স্বরূপ। কারণ আলু হিমঘরে সংরক্ষণ করার সময় আলুর দাম ছিল ৪৫০ টাকা বস্তা। আর এখন আলু বিক্রি হচ্ছে ৩৬০ টাকা থেকে ৩৮০ টাকা বস্তা। এই লোকসানের বহরের সাথে যুক্ত হচ্ছে ডিসেম্বর মাসের হিমঘরের বর্ধিত ভাড়া। ফলে চরমভাবে লোকসানের মুখে আলু ব্যবসায়ী ও কৃষকরা। আলুর এই অবস্থা কেন? তার উত্তরে মহাসিন মণ্ডল জানান, আগে এখানকার আলু উত্তরবঙ্গ হয়ে আসাম রপ্তানি হতো।

—এরপর চারের পাতায়

‘ইনসাফ যাত্রা’ আমার গর্ব, আমার অহংকার

অন্তরা দত্ত

“আহ্বান শোনো আহ্বান
মাঠ-ঘাট বন পেরিয়ে
বন্যার মতো বেরিয়ে, আসে আহ্বান”

আমি ইনসাফ যাত্রী। একটি দুর্বার গতি, উত্তাল তালে আলোর পথে ছুটে চলেছে পথযাত্রীরা। আমি তার অংশ। এ এক এমন অনুভূতি যা ঠিক মিছিলের মধ্যে ওই মুহূর্তেই শুধু অনুভব করা সম্ভব। আমরা যারা এই লুটে-পুটে খাওয়া, স্বার্থ সিদ্ধির জমানায়—কিছু মাত্র পাওয়ার আশা না রেখে, খেটে খাওয়া মানুষের স্বার্থে বিকল্প ধারার রাজনীতি করি—তাদের এই সময়ে অন্তত একবার ইনসাফ যাত্রার পদযাত্রীদের সাথে পা মেলানো উচিত। আমাদের পাওয়ার ভাণ্ডার পূর্ণ করতে। অসংখ্য কিছু না পাওয়া মানুষের অফুরন্ত ভালোবাসায় নিজেদের ঝুলি ভরাতে। এই ইনসাফ যাত্রা কতটা সফলতা পাবে, বা রাজ্যের বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে কতটা প্রতিক্রিয়া তৈরি করবে—আমি জানি না। তবু যে ইতিহাস রচনার সূচনা হলো তার একটা অংশ হতে পেরে আমি সত্যি গর্বিত। লোকে বলে কিছু পেতে গেলে কিছু দিতে হয়। ইনসাফ যাত্রা শুরু হয় কোচবিহার জেলার জেনকিন্স স্কুলের সামনে থেকে ৩ নভেম্বর ডিওয়াইএফআই-এর প্রতিষ্ঠা দিবসের সকালে। পতাকা উত্তোলন, পুষ্পার্ঘ নিবেদন ও জনসভা দিয়ে শুরু হয়। প্রথম দিন শুরু করতে দেরি হওয়ায় আমাদের প্রাথমিক কষ্টটা বেড়ে গিয়েছিল নিঃসন্দেহে। সাড়ে বারোটায় শুরু করে কোচবিহারের শহর ঘুরে ২৩ কিমি রাস্তা পার করে যখন শেষ করেছিলাম তখন বিকাল সাড়ে চারটা কি তার বেশি হবে। যে পথ দিয়ে গেলাম তার বেশিরভাগটাই হাইওয়ে, দুপুরের প্রখর সূর্য মাথার উপর তার মধ্য দিয়ে রাজপথ জুড়ে এগিয়ে চলেছে জনসমুদ্র শ্বেত পতাকা হাতে। কেউ এম.এ পাশ ও বি.এড—করা বেকার ছেলেটা যে হাঁটছে, কেউ পরিযায়ী শ্রমিক ছুটি নিয়ে বাড়ি এসেছে মিছিলে হাঁটতে, যে যুবতী পাড়ার বদমাশ ছেলেদের চোখে চোখ রাখার সাহস রাখে কিন্তু পাশে কাউকেই পায় না, কেউ টেট পরীক্ষার আগে দুদিন সময় বের করে মিছিলে যোগ দিয়েছে। যে যুবতী মা নিজের এবং সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বিগ্ন তিনিও এসেছেন দিন বদলের স্বপ্ন বুনে। আমাদের অধিকাংশেরই হয়তো ২/৩ কিমি রাস্তা একসাথে হাঁটার অভ্যাস নেই, তার উপর ক্ষুধার্ত, ক্লান্ত পরিশ্রান্ত। তবু পথের মোড়ে মোড়ে মানুষের প্রাণঢালা সংবর্ধনা,

—এরপর তিনের পাতায়

নতুন চিঠি

৪ ডিসেম্বর, ২০২৩

অশনি সংকেত

৩ ডিসেম্বর যে চারটি বিধানসভার ভোটগণনা হল তার ফলাফল কিছুটা অপ্রত্যাশিত। রাজস্থান ও ছত্তিশগড়ে কংগ্রেসকে হারিয়ে ক্ষমতা দখল করেছে বিজেপি, মধ্যপ্রদেশে তারা নিজেদের গড় ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে। কংগ্রেস তেলেঙ্গানা বিধানসভায় সরকার গড়তে চলেছে, সেখানে হেরেছে কে সি আর-এর ভারত রাষ্ট্র সমিতি। সরল হিসেবে তিন রাজ্যে বিদায়ী সরকার প্রতিষ্ঠানবিরোধী হাওয়ায় ভেসে গেলেও মধ্যপ্রদেশে বিজেপি তা রুখে দিতে পেরেছে। সমস্ত ফল এখনও আসেনি, তার চুলচেরা রাজনৈতিক বিশ্লেষণ বাকি আছে। ভোটের এই ফল লোকসভা নির্বাচনে বিজেপিকে বাড়তি অক্সিজেন যোগাবে, INDIA জোটের পক্ষে বিজেপির মোকাবিলা করার লড়াই তাই নিঃসন্দেহে কঠিনতর হল এমনও মনে করছেন কিছু রাজনৈতিক বিশ্লেষক।

মিডিয়ায় ফলাফল বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কিছু বাজে কথা সুপরিকল্পিতভাবে প্রচার করা শুরু হয়ে গেছে। একথা ভুললে চলবে না হিমাচল প্রদেশ এবং কর্ণাটকে বিজেপিকে সরাসরি হারিয়েছে কংগ্রেস মাত্র কয়েকমাস আগে। কংগ্রেসের ক্ষমতা তাই শুধু আঞ্চলিক দলকে হারানোর শক্তি বলে ছোট করে দেখা উচিত নয়। আর জনমোহিনী প্রকল্পের পেটেন্ট নেই তাই তা চুরির প্রশ্ন নেই। এককভাবে বিজেপিকে পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল হারালেও বিজেপি অনেক আসন পেয়েছে। কেরলে বাম রাজ্যে তারা পা রাখার সুযোগও পায়নি।

বিজেপির এই জয়ের বিশ্লেষণে তাদের দ্বিচারিতা ভুললে চলবে না। ন'বছর ধরে 'রাওড়ি' রাজনীতির বিরোধিতা করে শেষ ঠেলায় পড়ে 'জনরঞ্জনী' প্রকল্প নিয়ে ভোটারদের আকর্ষণ করতে নামতে হয়েছে খোদ প্রধানমন্ত্রীকে। কংগ্রেস ছত্তিসগড়ে ঋণ মকুবের কথা বলেছে। তাকে ঠেকাতে ধানের ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের ওপর গাদা টাকা ভর্তুকির প্রতিশ্রুতি দিতে হয়েছে প্রধানমন্ত্রীকে। মধ্যপ্রদেশে গদি বাঁচাতে আমদানি করতে হয়েছে 'লাডলি বহেনা যোজনা'। এর অনেক কিছুই প্রতিশ্রুতিই থেকে যাবে, যেমন থেকে গেছে বছরে দু'কোটি বেকারের চাকরির বা 'কালাধন' ফেরানোর কথা। কিন্তু মানুষকে বিভ্রান্ত করে ক্ষমতা দখল করা সম্ভব হয়েছে—এখানেই রণকৌশলের জয়। এটা ক্রমশ প্রমাণিত হচ্ছে মন্দির আর হিন্দুত্ব দিয়ে আর ভোট পাওয়া যাবে না। সাম্প্রদায়িক মেরুকরণও কাজে আসবে না কারণ কাস্ট সেনসাসের দাবি জোরদার হচ্ছে। খেয়াল রাখতে হবে ভোট-শতাংশের বিচারে খুব পেছনে নেই বিরোধী শক্তি। মধ্যপ্রদেশে পার্থক্যটা ৮ শতাংশ হলেও ছত্তিশগড়ে তা মাত্র ৪ শতাংশ, রাজস্থানে আরো কম ২ শতাংশ মাত্র। এই হিসেব মাথায় রেখে, আত্মসন্তুষ্টি বর্জন করে একজোট হয়ে ঘুরে দাঁড়াতে হবে বিরোধীদের। INDIA জোটের নেতৃত্বে কে থাকবে সেই প্রশ্ন তোলা আসলে জোটকে দুর্বল করার মানসিকতার প্রকাশ এটাও মনে রাখা দরকার।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রাক্তনীদের সংস্থা 'আমরা সবাই'-এর বার্ষিক অনুষ্ঠান

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ২৭ নভেম্বর বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথিশালার মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হল 'আমরা সবাই'-এর ষষ্ঠ বার্ষিক পুনর্মিলন অনুষ্ঠান। 'আমরা সবাই' হল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনীদের একটি সংস্থা। প্রতি বছর একটি নির্দিষ্ট শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত যাঁরা পাস করেছেন তাঁরাই সদস্য হতে পারেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পথচলা শুরু ১৯৬০ সালের ১৫ জুন। এ-বছর সদস্য হবার সময়সীমা ছিল ১৯৯৩-৯৫ শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য অধ্যাপক আশিসকুমার পানিগ্রাহী, কর্মসচিব সুজিতকুমার চৌধুরী, অধ্যাপক সুমিতা চক্রবর্তী, জয়দেব সরখেল প্রমুখ। উপস্থিত ছিলেন গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য রজতকিশোর দে। তিনি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তনী। উপস্থিত ছিলেন ৬৮ জন প্রাক্তনী তথা সদস্য।

সংগঠনের পক্ষ থেকে এ-বছর চার প্রবীণ সদস্যকে সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয়। এঁরা হলেন সাহিত্যিক, নাট্যকর্মী নীলা কর; বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন কর্মসচিব প্রণবরঞ্জন বসুধর; ভারতী বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষিকা শান্তি বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বর্ধমান বিবেকানন্দ মহাবিদ্যালয়ের রসায়নের অধ্যাপক সত্যদর্শন দত্ত। প্রকাশিত হয় 'আমাদের গোলাপবাগ' নামে একটি স্মৃতিগ্রন্থ। এবার প্রকাশিত হল ষষ্ঠ খণ্ড। প্রত্যেকটি খণ্ডই এক একটি দলিল। সুমিতা চক্রবর্তী, রামসাধন মুখোপাধ্যায়, রেনুকা মাঝি, তপোপ্রকাশ ভট্টাচার্যকে নিয়ে পরবর্তী বছরের জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়।

সাংস্কৃতিক চর্চার জন্য হারমোনিয়াম

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান : সম্প্রতি সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি, বর্ধমান ১০ নং ওয়ার্ড কমিটিকে সংস্কৃতি চর্চার জন্য একটি হারমোনিয়াম দিলেন সুমনা চৌধুরী ও দিলীপ চৌধুরী। সংগঠনের পক্ষে কাকলি চক্রবর্তী তাঁদের অভিনন্দন জানিয়েছেন। দ্রুত তাঁরা মহিলাদের একটি কালচারাল টিম গঠন করে এলাকায় সাংস্কৃতিক চর্চা শুরু করবেন।

সতীদাহ-বিরোধী আইন থেকে বিধবা বিবাহ আইন

কাজী আবদুল করিম

১৮২০ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম। তিনি যখন ৯ বছরের ছাত্র তখন রামমোহন রায়ের উদ্যোগে সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন চলছে। ১৮২৯ সালের ৪ ডিসেম্বর ভারতের বড়লাট লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক আইনজারি করে সতীদাহ প্রথার অবসান ঘটান। আইনটি হলো রেগুলেশন-XVIII-1829। এই আইনের বিরুদ্ধে গোঁড়ারা শাস্ত্রের বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়ে আবেদন করেন ব্রিটিশ সরকারের কাছে। রামমোহন রায়ও এই আইনের পক্ষে হিন্দু শাস্ত্রের বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়ে আবেদন করেন।

রামমোহন রায় হিন্দু ধর্মশাস্ত্রে সহমরণ এবং অনুমরণ যে সর্বত্র সমর্থিত হয়নি তা প্রমাণ করেন। তিনি লেখেন 'অঙ্গীরা', 'হারীত', 'বিষ্ণু', শাস্ত্র সতীদাহ সমর্থন করলেও 'মুণ্ডকোপনিষৎ', 'কঠোপনিষৎ', 'মনুসংহিতা', 'বৃহস্পতিসংহিতা', 'যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা' এবং 'স্মার্ত ভট্টাচার্য' রঘুনন্দনের স্মৃতির বিধানে সহমরণ-অনুমরণ সমর্থিত হয়নি, বিধবাদের সুকঠোর ব্রহ্মচর্যের উপরে গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে। শাস্ত্রে স্ত্রী হত্যা একটি 'পাপ' বলে বার বার উল্লিখিত হয়েছে। তিনি যুক্তি দিয়ে লিখলেন 'শাস্ত্রবিরুদ্ধ স্ত্রীহত্যা একটি শাস্তিযোগ্য জঘন্য অপরাধ'। ১৮৩২ সালের ২৩ জুন রামমোহন রায়ের আবেদনপত্রের শুনানি হয় এবং ১৮৩২ সালের ১১ জুলাই গোঁড়াদের সতীদাহ প্রথার বিলোপের বিরুদ্ধে আবেদনপত্রের শুনানি হয়। ব্রিটিশ আদালত সব শুনে গোঁড়াদের আবেদন খারিজ করে সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে আইন Act. XVIII-1829 বলবৎ করেন।

রামমোহন রায়কে বলা হয় ভারতের নবজাগরণের পথিকৃৎ। তাঁর যখন ১৬ বছর বয়স তখন মূর্তিপূজা ও হিন্দু সমাজের কিছু গোঁড়ামির বিরুদ্ধে কিছু প্রবন্ধ রচনা করেন। ফলস্বরূপ গোঁড়া রক্ষণশীল পিতা রামকান্ত রায় তাঁকে অবিলম্বে বাড়ি ছেড়ে যেতে নির্দেশ দেন। তিনি তিব্বত চলে যান। সেখানে বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। এখানে লামাকে জীবন্ত দেবতারূপে গ্রহণ করতে অস্বীকার করায় জীবন সংশয় দেখা দেয়। তখন কিছু তিব্বতী রমণী তাঁকে প্রাণে বাঁচিয়ে পালাতে সহায়তা করেন। তখন থেকে নারীদের প্রতি তাঁর সহমর্মিতা প্রকাশ করেন ও নারীজাতির প্রতি দায়বদ্ধতা ও অধিকারের সপক্ষে লড়াই শুরু করেছিলেন। বাড়ি ফিরে এলে পিতা তাঁকে আবার গ্রহণ করেন।

রামমোহনের দাদা জগমোহনের মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী অলকামঞ্জুরীকে টানতে টানতে চিতায় সহমরণে নিয়ে যেতে দেখেছিলেন। বৌদির সেই আর্তনাদকে চাপা দিতে গোঁড়াদের ঢাকঢোল কাঁসর ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে যাওয়ার নির্মম সেই দৃশ্যকে তিনি ভুলতে পারেননি, তাই হিন্দুশাস্ত্র খুঁজেই এই প্রথার বিরুদ্ধে লেখা শুরু করেন। এই প্রথা উচ্ছেদের জন্য উঠে পড়ে লাগেন। সতীদাহ প্রথা অবসান ঘটানোর জন্য তিনি লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ককে ১৮৩০ সালের ১৬ জানুয়ারি অভিনন্দনবার্তা পাঠিয়েছিলেন, সেইসঙ্গে বিধবা নারীদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তাও চেয়েছিলেন। এই সময় তাঁকে অনেক নিন্দাবাক্যও শুনতে হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—"তিনি যে নিন্দালাভ করেছিলেন, সেই নিন্দাই তাঁর গৌরবের মুকুট।"

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন রামমোহন রায়ের উত্তরসূরী। দুজনের মধ্যে যোগসূত্রটি হলো মেয়েদের প্রতি শ্রদ্ধা ও দায়বদ্ধতা। দুজনেই বিশ্বাস করতেন স্ত্রীশিক্ষার বিকাশ ও বিস্তার ঘটাতে না পারলে সমাজের উন্নতি সম্ভব নয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মস্থান বীরসিংহ গ্রামে তাঁর বাল্যসহচরীর ১২ বছর বয়সে বিবাহ হয় এবং অল্পদিনেই বিধবা হয়। এই ঘটনা শোনার পর তিনি আঘাত পান। তাঁর মা ভগবতী দেবী যখন বলেন, "তুই এতদিন এত শাস্ত্র পড়িলি, তাহাতে বিধবার কি কোনো উপায় নাই?" ঈশ্বরচন্দ্র সংকল্প করেন তিনি বিধবাদের দুঃখ মোচনের চেষ্টা করবেন। শুরু করেন বিভিন্ন হিন্দু শাস্ত্র নিয়ে পড়াশুনা। এই সময় তিনি বর্ধমান শহরে পার্কাস রোডের ধারে প্যারীচাঁদ মিত্রের বাড়িতে থাকতেন। দক্ষিণ বাংলার স্কুল পরিদর্শক নিযুক্ত হওয়ার কারণেই বর্ধমানে থাকতেন। ১৮৫৪ সালের ২৮ জানুয়ারি তিনি রচনা করেন 'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা'। ২২ পাতার এই পুস্তিকা নিয়ে চলতে থাকে নানা আলোচনা-সমালোচনা। ১৮৫৫ সালের অক্টোবর মাসে বর্ধমানে বসেই পড়তে শুরু করলেন সত্যযুগের জন্য মনুসংহিতা, ত্রেতাযুগের জন্য গৌতম সংহিতা, দ্বাপর যুগের জন্য শঙ্কর সংহিতা, এবং কলিযুগের জন্য পরাশর সংহিতা নামক হিন্দু শাস্ত্রসমূহ। সবগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে অধ্যয়ন করে বার করলেন পরাশর সংহিতাকে বিধবা বিবাহের বিধান আছে।

কলকাতায় শোভাবাজারের রাজবাড়িতে দেশের সব বাঘা বাঘা শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের সামনে পরাশর সংহিতা পড়ে, ব্যাখ্যা করে প্রমাণ করলেন। তখন শাস্ত্রে বিধবা বিবাহ বলে কিছু নাই বলে যাঁরা গলা ফাটাচ্ছিলেন তাঁরা তখন শাস্ত্র ছেড়ে লোকাচারকে হাতিয়ার করে বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে নেমে পড়লেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁর বিধবাবিবাহ সংক্রান্ত দ্বিতীয় পুস্তিকা 'বিধবা বিবাহ উচিত কিনা' প্রকাশ করলেন। তিনি লিখলেন—"তোমরা মনে কর পতি বিয়োগ হইলেই স্ত্রীজাতির শরীর পাষাণময় হইয়া যায়, দুর্জয় রিপুবর্গ একেবারে নির্মূল হইয়া যায়?" এই পুস্তিকায় তাঁর গবেষণা ও পাণ্ডিত্য প্রকাশ পেলেও এজন্য তাঁকে শুধু অপমান বা উপহাস করা নয়, প্রাণে মেরে ফেলবারও চেষ্টা করা হয়। 'হিতবাদী' পত্রিকায় লিখেছিল—"বিদ্যাসাগর পথে বাহির হইলে লোকে ঘিরিয়া ফেলিত, কেহ পরিহাস করিত, কেহ গালি দিত।" অতীতে রামমোহন রায়ের বিরুদ্ধে যেমন করা হয়েছিল এক্ষেত্রেও তারই পুনরাবৃত্তি দেখা গেল।

১৮৫৫ সালের ৪ অক্টোবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর একটি আবেদনপত্র (ইংরেজিতে লেখা) ব্যবস্থাপক সভায় পেশ করলেন। এই আবেদনপত্রে ৯৮৭ জন স্বাক্ষর করেন। প্রথম স্বাক্ষরটি ছিল বর্ধমানের মহারাজা মহাতাব চাঁদ-এর এবং শেষ স্বাক্ষরটি ছিল ঈশ্বরচন্দ্রের। ১৮৫৫ সালের ১৭ নভেম্বর ব্যবস্থাপক সভায় এই সভার সদস্য স্যার জেমস কলভিন এবং গ্রান্ট সাহেব পাণ্ডুলিপিটি পেশ করেন এবং সভায় অনুমোদিত হয়ে তা সিলেক্ট কমিটিতে যায় ১৮৫৬ সালের ১৯ জানুয়ারি।

১৮৫৬ সালের ১৭ মার্চ উক্ত পাণ্ডুলিপির বিরুদ্ধে রাজা রাধাকান্ত দেব একটি আবেদনপত্র ব্রিটিশ সরকারের কাছে পেশ করেন। তাতে ৩৬,৭৬৩ জনের স্বাক্ষর ছিল। বিভিন্ন জেলা থেকেও কিছু পণ্ডিত হিন্দু বিধবা বিবাহ আইন সম্পর্কিত পাণ্ডুলিপির বিরুদ্ধে আবেদনপত্র জমা দেন। সেইসব ৪০টির বেশি আবেদনপত্রে ৩৬,০০০ জনের স্বাক্ষর ছিল। বিদ্যাসাগরের আবদনের পক্ষে ১৫টি আবেদন পত্রেও ৫,০০০ জনের স্বাক্ষর ছিল। ব্যবস্থাপক সভায় সমগ্র আবেদনপত্র নিয়ে আলোচনা হয়, সদস্য স্যার জেমস্ কলভিন ও গ্রান্ট সাহেব বিদ্যাসাগরের পাণ্ডুলিপিটির পক্ষে মত দেন এবং ১৮৫৬ সালের ৩১ মে সিলেক্ট কমিটিতে দাখিল করেন। সতীদাহ প্রথা বিলোপের ২৭ বছর পর ১৮৫৬ সালের ২৬ জুলাই (১২৬৩ বঙ্গাব্দের ১২ শ্রাবণ) রবিবার 'হিন্দু বিধবা বিবাহ আইন' পাশ হয়। নাম Act. XV of 1856। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বলেন 'এই আইন প্রবর্তন আমার জীবনে প্রধান সৎকার্য।'

এবার এই আইন মোতাবেক বিবাহ দেওয়ার জন্য পাত্র-পাত্রীর সন্ধান শুরু হয়। প্রথম হিন্দু বিধবা বিবাহের পাত্রী বর্ধমান জেলার খণ্ডঘোষ থানার পলাশডাঙ্গা গ্রামের ৬ বছর বয়সে বিধবা হওয়া কালীমতী মুখোপাধ্যায়। পিতা প্রয়াত ব্রহ্মানন্দ মুখোপাধ্যায়, মাতা লক্ষ্মীরাণী মুখোপাধ্যায়। কালীমতী যখন ৪ বছরের তখন তার বিবাহ হয় নদিয়া জেলার বহির্গাছি গ্রামের হরমোহন ভট্টাচার্যের সঙ্গে। ৬ বছর বয়সে কালীমতী বিধবা হন। কালীমতীর মাতা লক্ষ্মীরাণী বিধবা হয়ে বুঝেছিলেন বৈধব্য যন্ত্রণা, তাই তাঁর ১২ বছরের কন্যার বিধবাবিবাহে সম্মত হন।

পাত্র ছিলেন প্রসিদ্ধ কথক রামধন তর্কবাগীশের পুত্র শ্রীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন। শ্রীশচন্দ্র সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন। এঁদের বাড়ি ছিল নদিয়া জেলার খাটুরার গ্রামে।

বিবাহের দিন স্থির হয় ১৮৫৬ সালের ৭ ডিসেম্বর (২৩ অগ্রহায়ণ ১২৬৩ বঙ্গাব্দ)। বিবাহবাসর ১২ নং সুকিয়া স্ট্রীট-এ বিদ্যাসাগরের বন্ধু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি। কন্যাপক্ষ বরযাত্রী এবং অন্যান্য মিলে ২ হাজার জনের খাওয়ার আয়োজন হয়েছিল। বিদ্যাসাগর নিজে দশ হাজার টাকা খরচ করেন। কন্যাপক্ষ থেকে গহনাসহ পাঁচ হাজার টাকা খরচ করেন। পুরোপুরি হিন্দু মতে এই বিবাহ হয়। বরের পালকী ধরেন রামগোপাল ঘোষ, হরচন্দ্র ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ, শম্ভুনাথ পণ্ডিত, দ্বারকানাথ মিত্র প্রমুখ বিশিষ্টজনেরা। উপস্থিত ছিলেন বর্ধমানের মহারাজা মহতাব চাঁদ, সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন, ভরতচন্দ্র শিরোমণি, প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ, তারকনাথ তর্কবাগীশ, হরিনাথ ন্যায়রত্ন, নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায়, মাধব গোস্বামী সহ বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ।

এই বিবাহের নিরাপত্তা দিতে সরকারের পক্ষ থেকে প্রচুর গোরা সৈন্য পাঠানো হয়।

সফলভাবে প্রথম বিবাহ অনুষ্ঠান হওয়ার পর বিদ্যাসাগর বলেছিলেন—"বই লিখে, বক্তৃতা দিয়ে ধর্মবিশ্বাস, কুসংস্কার কাটানো যাবে না, শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে, জ্ঞানের আলো জ্বালিয়ে তা করতে হবে।" তিনি নিজ পুত্র নারায়ণচন্দ্রের সঙ্গে বিধবা ভবসুন্দরীর বিবাহের সঙ্গে ৬০ জন বিধবার বিবাহ দিয়েছিলেন। এজন্য তাঁর খরচ হয়েছিল তৎকালীন দিনে ৮০ হাজার টাকা। রামমোহন রায় এবং বিদ্যাসাগরের দাবি ছিল নারীদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা। সেই অর্থনৈতিক নিরাপত্তা আইন হয়েছিল ১৯৫৬ সালে, অর্থাৎ ১০০ বছর পর। যখন হিন্দু-উত্তরাধিকার আইনে পিতার ও স্বামীর সম্পত্তির অধিকারী হন নারীরা।

তথ্যসংগ্রহ

১) বিদ্যাসাগর চরিত—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২) সার্ধ-দ্বিশতবর্ষে রামমোহন রায়—কোরক সংকলন
৩) বিদ্যাসাগর—শ্রীবিহারীলাল সরকার
৪) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর : একটি মার্কসবাদী মূল্যায়ন—প্রভাস ঘোষ।

বিজ্ঞানে নোবেল ২০২৩

চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রতি বছরের মতো এবারেও অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে নোবেল পুরস্কারের ঘোষণা হয়েছে। আগামী ১০ ডিসেম্বর ২০২৩ স্যর আলফ্রেড নোবেলের মৃত্যুদিনে প্রাপকদের হাতে এই পুরস্কার তুলে দেওয়া হবে। এই প্রেক্ষিতে আমরা দেখবো বিজ্ঞানে কারা এই পুরস্কার পেলেন, কী তাঁদের আবিষ্কার।

চিকিৎসাবিজ্ঞান :

চিকিৎসাবিজ্ঞানে ২০২৩ সালের

নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হলেন হাঙ্গেরিয়ান বিজ্ঞানী কাতালিন কারিকো ও আমেরিকান বিজ্ঞানী ড্রু ইয়াইসম্যান। বিজ্ঞানী কাতালিন কারিকো ১৩তম মহিলা যিনি নোবেল পুরস্কার পেলেন। নোবেল অ্যাসেম্বলি তাদের ঘোষণায় বলেছে "এঁদের যুগান্তকারী গবেষণা থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে মেসেঞ্জার আর এন এ কিভাবে শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতার সাথে যুক্ত হয়ে আমাদের রোগ প্রতিরোধে মৌলিক পরিবর্তন করেছে। এর ফলেই শতাব্দীর ভয়ঙ্কর কোভিড অতিমারীর প্রতিষেধক টিকা আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে।" আমরা সবাই জানি, একটি প্রতিষেধক টিকা নির্দিষ্ট কোনো রোগের জীবাণুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতাকে বহুগুণ বাড়িয়ে দেয় ও শরীরে রোগের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। পোলিও, হাম ইত্যাদি রোগের প্রতিষেধক টিকার ক্ষেত্রে এই রোগের মৃত বা দুর্বল ভাইরাস নির্দিষ্ট মাত্রায় শরীরে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়। স্বভাবত, শরীরে এই রোগের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত প্রতিরোধ ক্ষমতা নিয়ে 'অ্যান্টিবডি' তৈরি হয় ও প্রকৃত ভাইরাস সংক্রমণের সময় এই অ্যান্টিবডি রোগ প্রতিরোধ করে। প্রযুক্তি বিকাশের সাথে সাথে সম্পূর্ণ ভাইরাসের পরিবর্তে, ভাইরাসের একটি জেনেটিক কোড, টিকাকরণের মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করানো সম্ভব। তবে এই জাতীয় টিকার বিপুল উৎপাদনের জন্য সেল কালচার বা নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থায় কোষ বৃদ্ধির পরিকল্পনা প্রয়োজন, যা আদতে সময়সাপেক্ষ। কোভিড-১৯-এর ব্যাপকতার নিরিখে সময় নষ্ট না করে, অতি দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন ছিল। এই পরিস্থিতিতেই mRNA প্রযুক্তি গুরুত্বপূর্ণ বলে প্রমাণিত হয়েছে। এই প্রযুক্তির মূল বিষয় হল, পুরো ভাইরাসের পরিবর্তে ভাইরাল উপাদানের জেনেটিক কোডের অংশটি ভ্যাকসিন তৈরিতে ব্যবহৃত হয়েছে। mRNA প্রযুক্তির ভ্যাকসিন শরীরে স্পাইক প্রোটিনের অনুলিপি তৈরি করতে নির্দেশ দেয়। এটি একটি নিরীহ বাহক ভাইরাস যা শরীরে প্রবেশ করে ভাইরাস দমনকারী অ্যান্টিবডি গঠনকে বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। বিপরীতে প্রকৃত রোগ আক্রমণের সময় এই অ্যান্টিবডি ভাইরাস দমনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। Moderna ও Pfizer এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে ভ্যাকসিন তৈরি করে। পরে আরও নানা ভ্যাকসিন তৈরি হয়েছে। দেরিতে হলেও আমাদের দেশে এই প্রযুক্তি প্রয়োগ করে ভ্যাকসিন তৈরি হয়েছে। বিজ্ঞানীরা বলছেন এই প্রযুক্তি ব্যবহার ক্যানসার, ডেঙ্গু ও আরো অনেক রোগের প্রকোপ কমাতে সাহায্য করবে।

পদার্থবিজ্ঞান :

পরমাণু ও অণুর ভেতরে ইলেকট্রনের গতি প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করার নতুন দিশা আবিষ্কার করে তিন পদার্থবিজ্ঞানী ২০২৩ সালে নোবেল পুরস্কার অর্জন করলেন। পিয়ের আগোস্তিনি (ওহিও স্টেট ইউনিভার্সিটি, আমেরিকা), ফেরেঙ্ক ক্রাউজ (ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক ইনস্টিটিউট অফ কোয়ান্টাম অপটিক্স, জার্মানি) ও অ্যান লুইয়ের (লুন্ড ইউনিভার্সিটি, সুইডেন) আলোর অতি ক্ষুদ্র স্পন্দন সৃষ্টি করে ইলেকট্রনের চলাচল বা শক্তি পরিবর্তনের দ্রুত প্রক্রিয়া পরিমাপ করতে সক্ষম হয়েছেন। আমরা যদি একটি ঘূরন্ত সিলিং ফ্যানের দিকে তাকিয়ে দেখি তবে আলাদা করে ফ্যানের ব্লেড চেনা যাবে না, বরং ঘূরন্ত ব্লেডগুলির একটি ঝাপসা ছবি দেখা

যাবে। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলির সীমাবদ্ধতার জন্যেই দ্রুত চলমান ঘটনা পৃথকভাবে চিহ্নিত করা যায় না। হাই-স্পিড ফোটোগ্রাফি ও দ্রুত আলোকসম্পাতের আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে খণ্ডচিত্রের স্ন্যাপশট নিতে হলে এক্সপোজার সময়কেও একটি পূর্ণ স্পন্দন সময়ের কম হতে হবে। এই বছরের বিজয়ী বিজ্ঞানীরা এমন ক্ষুদ্র মাপের আলোর ঝলক তৈরিতে সক্ষম হয়েছেন যা ইলেকট্রনের দ্রুত গতির স্ন্যাপশট নিতে পারবে। অ্যান লুইলয়ের একটি নিষ্ক্রিয় গ্যাসের মধ্যে বিশেষ লেজার রশ্মি পাঠিয়ে আলোর বিভিন্নতা পর্যবেক্ষণ করেছেন। তিনি হলেন পঞ্চম মহিলা পদার্থবিদ যিনি নোবেল পুরস্কার পেলেন। পিয়ের আগোস্তিনি ও ফেরেঙ্ক ক্রাউজ এই পরীক্ষা থেকে অতি ক্ষুদ্র আলোক সপন্দন পরিমাপ করতে পেরেছেন। যে-কোনো পরিমাপ বুঝতে হলে এই পর্যবেক্ষণের একটি লক্ষণীয় পরিবর্তনের যে সময় দরকার তার চেয়েও কম সময়ে এই কাজ শেষ করতে হবে। এই পরীক্ষা করতে গিয়ে পরমাণুর অভ্যন্তরে সময় পরিমাপের নতুন একক তৈরি হয়েছে। এতদিন পর্যন্ত সময়ের ক্ষুদ্রতম একক ছিল ফেমটো-সেকেন্ড, এক সেকেন্ডকে একের পিঠে পনেরোটা শূন্য দিয়ে ভাগ করলে যে সংখ্যা আসে তার নাম ছিল ফেমটো-সেকেন্ড। এই সময়ে আলো ০.৩ মাইক্রোমিটার যেতে পারে। আরো সহজ ভাষায় বলতে গেলে ৩২০ লক্ষ বছর যতগুলি সেকেন্ড আছে, এক সেকেন্ডে ঠিক ততগুলি ফেমটো-সেকেন্ড আছে। এইভাবেই নতুন সময় একক বলা হয়েছে বিশ্ব সৃষ্টি থেকে আজ পর্যন্ত যত সেকেন্ড অতিবাহিত হয়েছে, এক সেকেন্ডে ঠিক ততগুলি অ্যাটো-সেকেন্ড আছে অর্থাৎ এক সেকেন্ডকে একের পিঠে আঠারোটা শূন্য দিয়ে ভাগ করলে যে ক্ষুদ্র সংখ্যা হবে তাই হল এ অ্যাটো-সেকেন্ড। এবছরের নোবেল বিজয়ীরা এই সময়ে ইলেকট্রনের চলাচলের চিত্র গ্রহণ করেছেন। ফলে অ্যাটো-সেকেন্ড পদার্থবিজ্ঞান একটি নতুন শাখা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে চলেছে, যাকে কাজে লাগিয়ে পরমাণুর ভেতরের ঘটনা পর্যবেক্ষণ যেমন সহজ হবে, তেমনি চিকিৎসাবিজ্ঞানসহ বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায় এই প্রযুক্তি প্রয়োগ মানব কল্যাণে ব্যবহৃত হবে।

রসায়ন :

রসায়নের ছাত্র মাত্রেই জানেন,

কোন পদার্থের রাসায়নিক ধর্ম নির্ভর করে পদার্থে ইলেকট্রনের সংখ্যার উপর। কিন্তু ন্যানো স্কেলে সেই পদার্থের ধর্ম তার আকৃতি নির্ভর। এখানে ন্যানো স্কেল কথার অর্থ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অণু-পরমাণুর মাপের, যাদের বৈশিষ্ট্য কোয়ান্টাম ঘটনা দিয়ে ব্যাখ্যা করা হয়। এই সূক্ষ্ম মাপের কণার বৈজ্ঞানিক নাম কোয়ান্টাম ডট বা কোয়ান্টাম বিন্দু। কোয়ান্টাম ডট গবেষণার স্বীকৃতিতে ২০২৩-এ নোবেল পুরস্কার পেলেন মোঙ্জি বাওয়েন্ডি (MIT, USA), লুই ব্রুস (Columbia University, USA) ও অ্যালেক্সি একিমভ (Nanocrystals Technology, NY, USA)। তাত্ত্বিকভাবে বিজ্ঞানীরা জানতেন যে কোয়ান্টাম ডট বা ন্যানো-পার্টিকেলগুলির বৈশিষ্ট্য আকার নির্ভর, কিন্তু এর প্রযুক্তি ও ব্যবহারিক প্রয়োগ নিয়ে সীমাবদ্ধতা ছিল। বিগত দুই শতাব্দীতে পদার্থবিজ্ঞানীরা আলোর বৈশিষ্ট্য নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে কাচ নির্মাণকারীদের জ্ঞানকে কাজে লাগান। বিজ্ঞানীরা দেখেন কেবলমাত্র একটি পদার্থ ব্যবহার করেই বিভিন্ন রঙের কাচ প্রস্তুত করা সম্ভব। আসলে রঙীন কাচ ব্যবহার করেই আলোর বিভিন্ন বর্ণের তরঙ্গদৈর্ঘ্য বের করার কাজটি করা হতো। এই রঙের বিভিন্নতা তৈরি করতে গলিত কাচ কোন নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় কতক্ষণ রাখা হবে তার উপর নির্ভর করে। যেমন ক্যাডমিয়াম সেলেনাইড ও ক্যাডমিয়াম সালফাইডের মিশ্রণ তাপমাত্রার ভিন্নতায় লাল বা হলুদ করতে পারে। ১৯৮০-র দশকের গোড়ার দিকে অ্যালেক্সি একিমভ কপার ক্লোরাইড নিয়ে পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখেন, তাপ বেশি থেকে কমের দিকে গেলে কাচের রং হলুদ থেকে নীলাভ হয়। রাসায়নিকটির গঠনবৈশিষ্ট্য থেকে বোঝা যায় তাপের পরিবর্তনে কপার ক্লোরাইড গেলাস সাইজের বদল হয়। ১৯৮৩ সালে লুই ব্রুস ক্যাডমিয়াম সালফাইড নিয়ে পরীক্ষা করতে গিয়ে একই সিদ্ধান্তে পৌঁছান। ১৯৮৮-তে বাওয়েন্ডি এই গবেষণায় যোগদান করেন ও আরো সহজতর পদ্ধতিতে এই ধরনের কোয়ান্টাম ডট তৈরি করতে সক্ষম হন। আজকের দিনে ইলেকট্রনিক যন্ত্রশিল্প ছাড়াও জীবনবিজ্ঞানে নানা প্রয়োগে কোয়ান্টাম ডট অপরিহার্য।

ক্যারাটেতে সোনা জয়ী কাটোয়ার স্কুল পড়ুয়া অনির্বাণ কর্মকার

বিদ্যুৎ ভৌমিক : কর্ণাটকের মহীশূর চামুণ্ডি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতায় পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়ার ভারতীভবন উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র অনির্বাণ কর্মকার অনূর্ধ্ব ১৬ বিভাগের খেলায় 'কাতা' বিভাগে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে প্রথম স্থান অধিকার করে স্বর্ণপদক জিতে নিয়েছে। মহীশূরে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় ভারত ছাড়াও শ্রীলঙ্কা জাপান বাংলাদেশ সৌদি আরবের সর্বমোট ১৪৫০ জন প্রতিযোগী অংশ নেয়। ডিস্ট্রিক্ট ও স্টেট পর্যায়ের তার জয়যাত্রা অব্যাহত। ২০২২ সালে ন্যাশনাল ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতায় অনির্বাণ স্বর্ণ পদক ছিনিয়ে নেয়। চলতি বছরে ন্যাশনাল ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপ কম্পিটিশনে অনির্বাণ একটি রৌপ্য পদক ও একটি ব্রোঞ্জ পদক দখলে রাখে। এরপরই আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় স্বর্ণ পদক জয় করে অনির্বাণ নিজের নামের প্রতি সুবিচার করেছে।

আমার গর্ব, আমার অহংকার

—প্রথম পাতার পর

মিছিল দেখতে ঘরের থেকে রাস্তায় বেরিয়ে আসা, সেও এক প্রকার সামিল হওয়া। দেখতে দেখতে আমাদের ভালোলাগা, সৌজন্যের হাসি। না, সে হাসি কষ্ট চেপে রেখে কৃত্রিম হাসি নয়—কষ্ট ভুলে গিয়ে আন্তরিক ভালোলাগার হাসি। বেশিরভাগ পদযাত্রীরই পায়ে ফোস্কা পড়ে গেছে, কারুর কেটে গেছে। দুপুরের খাবার খেতে বসে মনে হয়েছে আর হাঁটতে পারব না। কিন্তু যখন আবার প্রস্তুত—হাতে শ্বেত পতাকা, মুখে শ্লোগান এক পা দু'পা বাড়াতেই সব ব্যথা মিলিয়ে গেছে মিছিলের তালে তালে। এক কথায় বলতে গেলে আমার এযাবৎকালের অভিজ্ঞতায় জীবনে কখনও এত পরিশ্রম একসাথে করিনি,

গলসীতে সংবর্ধনা সভায় বক্তব্য রাখছেন মীনাক্ষী মুখার্জী মঞ্চে মহঃ সেলিম।

আবার একই সাথে এত ক্লান্তি কখনও উপেক্ষাও করিনি। দুপুরের বাসে করে বাচ্চারা যখন স্কুল থেকে ফিরছিল স্বভাবতই সুসজ্জিত মিছিল দেখে আনন্দ পাচ্ছিল, উৎসাহে হাত নাড়ছিল, কেউ কেউ তো ইনকিলাব-জিন্দাবাদও বলল ওদের কচি কচি মুখগুলো দেখতে দেখতে আমরাও নতুন করে এই লড়াইয়ের মানে খুঁজে পেলাম। ওদের প্রজন্মকে বাঁচানোর—ওদের ভবিষ্যতের সাথে যেন ইনসাফ হয়—তার জন্যই তো আমাদের লড়াই-আন্দোলন। যে প্রবীণ কমরেডরা বিভিন্ন জায়গায়, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ির খেটে খাওয়া মানুষের সাথী—তাঁরা যে পরম যত্নে আমাদের খেতে দিয়েছেন, সুবিধা অসুবিধার খোঁজ নিয়েছেন, কোথাও যেচে তারাও তো ভরসা করতে চেয়েছেন, বিশ্বাস করতে চেয়েছেন তারা যে লড়াইটা টেনে নিয়ে এসেছেন, যে স্বপ্ন দেখেছেন, তাকে বয়ে নিয়ে যাব আমরা। অনুভব করিয়েছেন আজকের পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে এই যুবদের "যৌবনের ডাকে জনগণের ব্রিগেড" সফল করা তাদের কাছেও কতটা প্রাসঙ্গিক। যে শ্রমিকরা কারখানার পাশে এসে, মিড ডে মিলের দিদিরা স্কুলের পাশে, খেতমজুররা কাজের ফাঁকে রাস্তায় উঠে এসেছেন ইনসাফের আশায়। যে কৃষক ভাই মীনাক্ষীকে ছুঁতে পেরে চোখের জলে ভেসেছেন এই দুর্দিনের দিনে নিজেদের একজনকে ভরসা করতে চেয়ে, যে কাঁদতে কাঁদতে কোলের ছেলেকে ওদের কোলে তুলে দিলেন যেন সন্তানের ভবিষ্যতের ভার তুলে দিলেন, যে শহিদ বাবা-মা পরম যত্নে মীনাক্ষী-ধ্রুবর মাথায় হাত বুলিয়েছেন যেন এই আদর তার ছেলের কাছে পৌঁছে যাবে, যে শহিদের স্ত্রী মীনাক্ষীর হাত ধরে রেখেছেন মুখে কিছু বলতে পারেননি তিনি আশা করেছেন এরাই গাইয়ে দেবে ইনসাফ।

অনেকদিন ধরে তৃণমূলীদের তোলা দিতে দিতে যে দোকানদার দাদা বিরক্ত, সে আজ স্বেচ্ছায় ভালোবেসে দিতে পারার সুখটাকে নতুন করে উপভোগ করেছেন পদযাত্রীদের জলের বোতল, চকোলেটের কৌটো, ও.আর.এস-এর প্যাকেট দিয়ে। যে গ্রামীণ পুলিশ বন্ধু নিতান্ত পেটের দায়ে সরকারি দলের ব্রিজের উপর থেকে বাইক আরোহী বাইক থামিয়ে হাত নাড়ছেন—মিছিলের তরঙ্গ ইথারে ইথারে মিলে গেছে তার হাতের তরঙ্গের সাথে। যে বয়স্ক মায়েরা, দাদু-দিদিমারা মীনাক্ষী, ধ্রুবকে পরম আন্তরিকতায় মাথায়-মুখে হাত বুলিয়ে ভালোবেসে আশীর্বাদ করেছেন—সেই ভালোলাগা কি আমাদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েনি? তাদের ভালোবাসা আমাদের ভালোবাসা মিলে মিশে এক হয়ে গেছে। এক হয়ে গেছে না পাওয়া, বঞ্চনার যন্ত্রণা, প্রতিবাদের ভাষা। এক হয়ে গেছে ভবিষ্যতের স্বপ্ন। এক জেলা থেকে আর এক জেলায় যেতে যেতে যেমন পাল্টে গেছে ভৌগোলিক অবস্থান, প্রাকৃতিক পরিবেশ—মানুষের কথাবার্তা, সংস্কৃতি, কালচার, তাল মেলাতে গিয়ে হোঁচট খেয়েছি, তবুও গেয়েছি, নেচেছি হাসিতে-হাসি মিলিয়েছি তাঁদের সাথে, কারণ জেনেছি দিনের শেষে আমাদের লড়াইটা এক। জাত-ধর্ম-কালচার, ভৌগোলিক অবস্থান সবকিছুর উর্ধ্বে ভাত-কাপড়ের লড়াই, কাজ পাওয়ার লড়াই। যে মায়েরা বা বাবারা মীনাক্ষী বা ধ্রুবর কোলে তুলে দিচ্ছেন তাদের সন্তানকে, ছবি তুলতে নিয়ে আসছেন—তাদের সবাই কি সেলিব্রেটি হিসাবে! তারা তো ভাবতেও পারেন, চাইতে পারেন তাদের সন্তানও একদিন এই মিছিলে সামিল হবে। এই ইনসাফ যাত্রার ছবির সাথে হয়তো সেই অনুভূতিটাও পৌঁছে যাবে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে। বাজারে বা রাস্তায়, পথচলতি যে সাধারণ মানুষ ছোটো ঘর, ফ্ল্যাটের জানালায় দাঁড়িয়ে যে বাসিন্দা মিছিল দেখছেন, টানা পোড়েনের মধ্যে রয়েছেন, ভাবছেন কী করা যায়, দেশ ও রাজ্যের এই পরিস্থিতিতে ঘরে চুপ করে বসে থাকাটাও অস্বস্তিকর, ভাবছেন কিছু যদি করা যেত! এই ইনসাফ যাত্রার মানুষের ঢল, মীনাক্ষী, ধ্রুব, কলতান, সোহম, অয়ন সহ অন্যান্য বক্তাদের আহ্বান তাদের কি টানবে না ব্রিগেড সমাবেশে! যারা নিতান্তই আসতে পারবেন না, মনে মনে কি চাইবেন না ব্রিগেড মিটিং সফল হোক, বঞ্চনার রাত শেষ হোক, বদল হোক রাজনৈতিক পরিস্থিতির। সেই দিন বদলের ডাক ঘরে ঘরে পৌঁছে দিচ্ছে যে মিছিল, আমি তার অংশ। এটাই আমার অহংকার।

গ্রামবাসীদের উদ্যোগে কবি কাশীরাম দাসের স্মৃতিসৌধ স্থাপন

বিদ্যুৎ ভৌমিক : ষোড়শ শতকের স্বনামধন্য কবি মহাভারতের বাংলায় রচনাকার কাশীরাম দাসের বসতভিটেয় গ্রামবাসীদের তোলা চাঁদায় স্থাপিত হয়েছে স্মৃতিসৌধ। এই সৌধটি নির্মাণে খরচ হয়েছে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ টাকা। এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন কবি কাশীরাম দাস গবেষক ও তথ্যচিত্র নির্মাতা নন্দিতা চক্রবর্তী ও ওই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সাংবাদিক রণদেব মুখোপাধ্যায়কে কাশীরাম দাস স্মৃতিরক্ষা সমিতি সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন। এই উপলক্ষে স্থানীয় স্কুলের কচিকাঁচা পড়ুয়ারা বর্ণময় সাজসজ্জায় শোভিত হয়ে মহাভারতের নানান চরিত্র চিত্রণে শোভাযাত্রা সহকারে গ্রাম পরিক্রমা করে।

কাটোয়ার সিঙ্গি গ্রামে (এর পূর্ব নাম সিদ্ধি গ্রাম, দাঁইহাটের সন্নিকটে) কবি কাশীরাম দাসের বসতভিটেতে সুদীর্ঘ একুশ বৎসর যাবৎ আঠারো গর্বে কবি মহাভারত মহাকাব্য বাংলায় লিখেছিলেন। কয়েক দশক ধরে অযত্নে লালিতপালিত এই বসতভিটের প্রতি কারো নজর ছিল না। চরম অবহেলায় পড়ে থাকা এই ভিটেটি এলাকার মানুষজন উদ্যোগী হয়ে কাশীরাম দাস স্মৃতিরক্ষা সমিতি গঠন করে কবির ভিটে সংরক্ষণে প্রয়াসী হন ও স্মৃতিসৌধ স্থাপন করেন। এ বিষয়ে স্মৃতিরক্ষা সমিতির কর্মকর্তা ক্ষুদিরাম দত্ত জানান, শুধু কবি কাশীরাম দাসই নন, তাঁর পরিবারের সকলেই কাব্যপ্রতিভা সম্পন্ন তা কারুর অজানা নয়। স্মৃতিরক্ষা সমিতির সদস্যরা চান, মরমী কবি কাশীরাম দাসের ভিটে রাজ্য সরকার অধিগ্রহণ করুক ও এই স্থানেই কবির লেখা পুঁথিপত্র দলিল দস্তাবেজ ও তাঁর ব্যবহৃত জিনিসপত্র সমাহারে একটি সংগ্রহশালা তৈরি হোক।

সমবায় বাঁচাও মঞ্চের সম্মেলন

নিজস্ব সংবাদদাতা : সমবায় বাঁচাও মঞ্চের কালনা শহর শাখার ২য় সম্মেলন আজ বিকেলে অনুষ্ঠিত হল, এবিপিটিএ-র দপ্তরের। উদ্বোধক ছিলেন সমবায় বাঁচাও মঞ্চের রাজ্য কমিটির সদস্য সমীর মুখার্জী। উপস্থিত প্রতিনিধিদের মধ্যে থেকে সমবায়ের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন। বিদায়ী কমিটির পক্ষে প্রতিবেদন পেশ করেন মৃদুলা রায়। সম্মেলন থেকে এগারো জনের নতুন কমিটি গঠিত হয়। সম্পাদক নির্বাচিত হন মৃদুলা রায় এবং সভাপতি নির্বাচিত হন রঘুনাথ গোগ। সমাপ্তি ভাষণে সমবায় বাঁচাও মঞ্চের জেলা কমিটির সদস্য কাজী নুরুল ইসলাম। সমবায় আন্দোলন কে আরও শক্তিশালী করার আহ্বান জানান।

সমুদ্রগড়ে শহিদ স্মরণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ২৯ নভেম্বর : শ্রদ্ধায় স্মরণ করা হয় কৃষক নেতা শহিদ খাদু খাঁকে। সারা ভারত কৃষকসভার পূর্বস্থলী-১ ব্লক কমিটির উদ্যোগে সমুদ্রগড় নিমতলা বাজারে এই স্মরণানুষ্ঠান হয়। উপস্থিত ছিলেন কৃষক নেতা সাহাদুল খান, দুলাল দাস, শোভন আলী শেখ, আব্দুল হামিদ শেখ প্রমুখ। ১৯৭১ সালের ২৯ নভেম্বর প্রকাশ্য দিবালোকে এই নিমতলা বাজারেই কংগ্রেসি ঘাতক বাহিনীর হাতে খাদু খাঁ শহিদ হন।

সিপিআই(এম) দরদীর জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২৮ নভেম্বর : সিপিআই(এম) ঘনিষ্ঠ সিপিআই(এম) দরদী হপন হেমব্রমের (৫৯) জীবনাবসান হয়েছে। কালনা-২ ব্লকের অকালপৌষ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত কাদিপাড়া গ্রামের নিজ বাড়িতে ২৮ নভেম্বর ভোর চারটে নাগাদ তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি বিগত কয়েক বছর ধরে মরণব্যাধি ক্যান্সার রোগে ভুগছিলেন। মৃত্যুকালে স্ত্রী, এক ছেলে ও এক মেয়ে বর্তমান।

পাখি-চোখ-৫৪

রত্না রশীদ

একটা ফরাসি প্রবাদ আছে, ভূতের মতোই সত্যিকারের ভালোবাসার কথা সব্বাই শুনেছে, কিন্তু দেখতে পায়নি কেউই। সে যাই হোক, মন মন বইপত্তর নেমেছে কিন্তু উল্লেখিত ওই দুই অদৃষ্টব্য ভূত ও ভালোবাসা নিয়ে। কেউ দেখেনি, তবু লিখেছে মন এর পর মন। চাট্টিখানি কথা!

ছোটোবেলায় শক্তিকাকু বলে একজন আমাদের বাড়িতে আসতেন। কাকু তো নয়, একটি ভূতের গল্পের ঝুড়ি। প্রায়ই আসতেন সন্ধ্যেবেলা। আর আমাদের পড়াশোনায় মন বসে! তাড়াতাড়ি পড়া শেষ করে চারজনে মিলে শক্তিকাকুকে ঘিরে ধরে বসতাম। মা তাড়াতাড়ি চা বিস্কুট এনে দিতো শক্তিকাকুর কাছে, যাতে আমাদের পড়া শেষ হবার আগে উনি উঠে চলে যান। কিন্তু কোনোদিন ডিনার না সেরে উনি আমাদের গৃহত্যাগ করেননি। মা মনে মনে ক্ষুণ্ণ হতো আমাদের সন্ধ্যের পড়াশোনা খানিক হলেও নষ্ট হতো বলে, কিন্তু ভদ্রতায় কিছু বলতে পারতো না। বাপিও বাড়ি থাকলে কিছু বলতো না ওঁকে, বাপিরই অফিসের স্টাফ। কিন্তু সব গল্প আমাদের ভাই-বোনেদের সঙ্গে।

সেটা ছিল এক শীতের অন্ধকার রাত। তখন আশ্বিন মাসেই শীত পড়ে যেতো, জব্বর বর্ষায় চতুর্দিক ঠাণ্ডা করে তবেই বিদায় নিতো। আমাদের সবার গায়ে সোয়েটার। কিন্তু নিচে কম্বলে বসে গল্প শুনতে গেলে সবাই মিলে একটা বড়ো বিছানার চাদরে পা-মাথা মুড়ে কাছাকাছি বসতে হয়, বিশেষত ভূতের গল্পে। কোনো একটা ছানাকেও যেন একা পেয়ে টুপ করে ঝুলিতে পুরে ফেলতে না পারে। শক্তিকাকু গল্প শুরু করলো—

হারাধন মানে হারু কুড়ি বছর বয়স থেকেই শহরে বসবাস করে। বাড়িতে বিধবা মাকে খরচ খরচা পাঠায়। চেষ্টা করে মাসে একবার গাঁয়ের ভিটেতে এসে মাকে দেখে যেতে। নইলে গাঁয়ের কারো হাতে টাকা ও চিঠি পাঠিয়ে দেয়। তবে মোটামুটি মাসে একবার তো মাকে দেখতে গ্রামের বাড়িতে আসেই সে। তো, একবার কী হলো শহরের মালিক কি একটা বেশ জরুরি কারণে কোনো কর্মচারীকেই ছুটি দিতে পারলো না। সবার ছুটি ক্যানসেল। কী আর করে হারু, গাঁয়ের একজনের সঙ্গে পথে দেখা হতে তার হাতে মায়ের জন্য টাকা পাঠিয়ে বলে দিল মাকে চিন্তা করতে বারণ করো, সামনের মাসে বাড়িতে যাবোই যাবো।

তো, সামনের মাস মানে দু'মাসের গ্যাপ হয়ে গেল। হারু বিকেল বিকেল মালিকের কাজ সেরে ট্রেনে চাপলো দেশে যাবে বলে। প্রতিবারের মতোই ট্রেন ঝিক্‌ঝিক্ করতে করতে নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে হারুকে নামিয়ে দিল। এসব অখ্যাত স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম মানে নিচু মাঠ। হারু লাফ দিয়ে নেমে তিন মাইল দূরে তার গ্রামের পথে হাঁটা দিল। গ্রামের দিকে সন্ধ্যে গড়াতেই লোকজন কমে যায়। পথে কাউকে না দেখে হারু তাই অতটা অবাক হলো না। কিন্তু চণ্ডীমণ্ডপও ফাঁকা দেখে হারুর বিস্ময়ের শেষ রইলো না—এমন তো সে জীবনে দেখেনি, সবে তো সন্ধ্যেরাত।

বাড়ি গিয়ে চাচের বেড়া ঠেলতেই মায়ের গলা—হাঁরু এঁলি বাপ।

—হ্যাঁ, তা তোমার কি সর্দি হয়েছে, গলা এমন খোনা খোনা কেন?

—ওঁ কিঁছু নাঁ। হাঁত মুঁখ ধুঁয়ে খেঁতে বোঁস বাপ্। খেতে বসে হারু মাকে বললো, ডালের সঙ্গে একটু কাগজি দাও না।

মা সঙ্গে সঙ্গে গিঁড়েতে বসে থেকেই হাত লম্বা করে বাড়িয়ে বাড়ির পেছনের গাছ থেকে টাটকা লেবু পেড়ে এনে হারুর সামনে রাখলো। হারুর তো চক্ষু তখন চড়ক গাছ, কথা বলতে পারছে না। অজ্ঞান হয়ে যেতে যেতেও দেখলো—মা তালগাছের সমান দু'পা দিয়ে ওদের বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে আকাশের দিকে চলে গেল।

সকালে জ্ঞান ফিরলে হারু স্টেশনের দিকে হাঁটা দিল। ভিন্ গাঁয়ের একজনের কাছে শুনলো, এক মাস আগে মড়কে গোটা গাঁ উজার হয়ে গেছে। কলেরা। (চলবে)

ক্ষোভ কৃষকদের

—প্রথম পাতার পর

জল ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যেহেতু চাষের পরিমাণ অনেকটাই বেশি সেক্ষেত্রে জল ছাড়ার পরিমাণ বাড়ানোর জন্য আবেদন জানানো হয়েছে। খবর ছড়িয়ে পড়া মাত্র জেলার চাষিদের মধ্যে ক্ষোভ দেখা যায়। গতবার যেখানে ৭৭ হাজার একর জল পাওয়া গিয়েছিল সেখানে এবার মাত্র ২৭ হাজার একর জমিতে বোরো চাষ করা যাবে। এবার ভাল বৃষ্টি হলেও জল কেন কম হলো তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। গতবার ধান চাষে মার খাওয়াতে এবার আশায় বুক বেঁধেছিলেন চাষি। খুব অল্প সময়ে ভাল ফলন পাওয়া যায় বলে বোরো চাষের দিকে মুখিয়ে থাকে।

শিবানন্দ পাল প্রণীত 'বিপ্লবী হরেকৃষ্ণ কোঙার' গ্রন্থটি পাওয়া যাচ্ছে—ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ-এর সমস্ত বিপণীতে। এছাড়াও 'নতুন চিঠি' পত্রিকা দপ্তর, ৬২ বি সি রোড, অনিতা সিনেমা লেন, বর্ধমানে। মূল্য—৩০০ টাকা।

মন্ত্রী বালুর কীর্তি ফাঁস

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৩ ডিসেম্বর : প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক-এর চুরি এবার ফাঁস হল পূর্ব বর্ধমান জেলার খণ্ডঘোষ এলাকার কালনা গ্রামে। ২০১২ সাল থেকে কৃষকের সহায়ক মূল্যের টাকা লুট করছে এখানকার মিল মালিক ও শাসকদল, দাবি সিপিআই(এম)-এর অভিযোগ। ভূতুড়ে কাণ্ড! সকাল ১০টা ২০ নাগাদ ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা ঢুকল, আর সাড়ে ১০টায় থেকে বেরিয়ে গেল। একাধিকবার এমন ঘটনা ঘটতে দেখে রাইসমিল শ্রমিক শেখ সামসুরজ্জোহা খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন, রাইসমিলের ধান কেনাবেচার টাকা লেনাদেন করতে মিল মালিকরা তাঁর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করছে। খবর নিয়ে জানা যায়, শুধু তাঁর একার নয়, রাইসমিলের বেশিরভাগ শ্রমিকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে ভুয়ো চাষি সাজিয়ে সরকারি সহায়ক মূল্যের টাকা এইভাবে আত্মসাত করা হয়েছে।

ঘটনা হচ্ছে ২০১২-'১৩ সালে চাষিদের কাছ থেকে রাইসমিলগুলিকে ধান কেনার নির্দেশ দেন মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। খণ্ডঘোষের বোঁয়াইচণ্ডী স্টেশন এলাকায় এক মিল মালিক তাঁর রাইসমিলের শ্রমিকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে কৃষকের সহায়ক মূল্যের নাম করে কোটি কোটি সরকারি টাকা আত্মসাত করে আসছে। শেখ শাব্বাদের ছেলে শেখ সামসুরজ্জোহা-র ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের সঙ্গে মোবাইল নম্বর যুক্ত ছিল। ফলে, কখন অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকছে এবং কখন বেরিয়ে যাচ্ছে তার মেসেজ পেয়েই সে জালিয়াতি ধরে ফেলে। ধরা পড়ে মিল মালিক মুখ বন্ধ করতে ওই শ্রমিককে ঘুষ দেওয়ার চেষ্টা করেন কিন্তু, তিনি তা প্রত্যাখ্যান করে।

২০১২ সাল থেকেই খণ্ডঘোষ এলাকায় রাইসমিল লবি ও বালি মাফিয়ারা সিন্ডিকেট গড়ে তুলে এইভাবে শুধু সরকারি অর্থ আত্মসাৎ নয়, রাজনৈতিকভাবেও ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে। খণ্ডঘোষে বালি ও মিল মালিকের সিন্ডিকেট এতটাই প্রভাবশালী যে, পঞ্চায়েতে কে প্রধান হবে তা ঠিক করে এই লবি। খণ্ডঘোষের গ্রামবাসীদের অভিযোগ, শশঙ্গ গ্রাম পঞ্চায়েতে শাসক দল প্রধান ঠিক করেছিল গোলোক বিশ্বাসকে। কিন্তু, বালি ও মিল মালিকের লবি সিন্ডিকেট তৈরি করে প্রধান করে তাদের পছন্দের রিম্পা প্রামাণিককে। এই ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের পিছনে কাদের হাত, কি বা তাদের উদ্দেশ্য? পুরো জালিয়াতিটা প্রকাশ্যে আনার জন্য সিপিএমের নেতৃত্বে আন্দোলন গড়ে উঠলে শাসকদল আক্রমণ করে গ্রামবাসীদের উপর। পুলিস, প্রশাসনকে সবকিছু জানানো হলেও দুর্নীতি আড়াল করতে এবার ঠুঁটো জগন্নাথের মতো ভূমিকা পালন করছে।

কৃষকরা চরম বিপাকে

—প্রথম পাতার পর

এখন উত্তরবঙ্গ আলু উৎপাদন করে নিজেদের চাহিদা তো মেটাচ্ছেই, পাশাপাশি আসামেও আলু রপ্তানি করছে।

ফলে আমাদের এখানকার আলু যাওয়া একেবারেই বন্ধ হয়ে গেছে। লোকাল বাজারই আমাদের ভরসা। তিনি আরো জানান কালনার এগারটি হিমঘরে এখনো গড়ে ১৫ শতাংশ আলু রয়ে গেছে। লোকাল বাজারে এত আলু বিক্রি করা সম্ভব হবে না। তাই শেষের দিকে দশ টাকা বস্তা আলু নিলাম করার সম্ভাবনা প্রবল।

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজড্ কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ
সাধনা প্রেস
১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান
Mob. 9434333820, 9635726620 (Fazlul), 8942808557 (Madhu)
E-Mail : sadhanapress09@gmail.com
ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। বার্তা সম্পাদক : দিনেশ ঝা। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক দিনেশ ঝা কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন : ৯৪৩৪২৫১৫৮৬। Mail : weeklynatunchithi@gmail.com মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪। মূল্য : ২ টাকা